Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p88-100. (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

বসাক তাঁতিদের চৈত্রপূজা

নিলয় কুমার বসাক
সহ-শিক্ষক, শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়
Email: nilaykrbasak@gmail.com

সারসংক্ষেপ : উৎসবপ্রিয় বাঙালির হরেক পালা-পার্বণের মধ্যে একটি হল গাজন। 'গাজন' শব্দটি এসেছে 'গর্জ্জন' থেকে। আবার গ্রাম-জনের উৎসব বা গাঁ-জন থেকেও এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। শিবের পূজাকে কেন্দ্র করে গাজন অনুষ্ঠিত হলেও এর আচার-বিচার, পূজা-পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদিতে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। গাজন বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিব ঠাকুরের পূজা, ঢাকের আওয়াজ, লাল কাপড় পরিহিত সন্ন্যাসীর দল, চড়ক গাছে বঁড়শি দিয়ে মানুষের পাক খাওয়া ইত্যাদি আর তার সাথে কিছু সংস্কার ও বিশ্বাসের ঘটাপূর্বক পালন। সাধারণ খেটে-খাওয়া জন-সমাজের জীবন-জীবিকা ও আটপৌরে যাপনচর্চার একটা বহিঃপ্রকাশ হল গাজন। বাংলা রামায়ণ রচয়িতা আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতিধন্য নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়াতেও এই উৎসব পালিত হয়। বর্তমানে ফুলিয়া বিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাজন উৎসব পালিত হয়। এগুলির মধ্যে টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নকারী বসাক তন্তুবায় সম্প্রদায়ের গাজন পালিত হয় একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব রীতিতে। এটি চৈত্রপূজা নামে পরিচিত। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় বাস ছিল এই তাঁতিদের। সেখানেই আজ থেকে প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে সূত্রপাত হয়েছিল এই পূজার। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে তাঁরা ফুলিয়াতে আসেন, সাথে নিয়ে আসেন তাঁদের চিরাচরিত সংস্কৃতি, আচার-বিচার, পালা-পার্বণ। চৈত্র মাসের শেষের দশ-বারো দিন তাঁতিরা তাঁতবোনা বন্ধ রেখে পালন করেন এই উৎসব। ঠাকুর স্নান, অধিবাস, দেলবন্দনা, ফির‍্যা, কবিতা গাওয়া, হরগৌরী নাচ, চড়ক, ভূতের মেলা, কবন্ধের পূজা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে এই চৈত্রপূজা পালিত হয়। বসাক তাঁতিদের এই চৈত্রপূজা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে লোকসাহিত্যেরও নানা উপাদান।

সূচক শব্দসমূহ : গাজন, বসাক তাঁতি, চৈত্রপূজা, শিবের পাট, দেলবাড়ি, কবিতা, চড়ক।

উৎসবপ্রিয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে একটি হল গাজন। শিবঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত এই গাজন হল লোকসংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। 'গাজন' শব্দটি এসেছে 'গর্জ্জন' থেকে[১] আবার গ্রাম-জনের উৎসব বা গাঁ-জন থেকেও এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[২] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু "গাজন" শব্দটি আসিয়াছে।"[৩] স্থানভেদে এর আচার-বিচার, পূজা-পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদিতে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। গাজন বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিব ঠাকুরের পুজো, ঢাকের

আওয়াজ, লাল কাপড় পরিহিত সন্ন্যাসীর দল, চড়ক গাছে বঁড়শি দিয়ে মানুষের পাক খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, সাথে কিছু সংস্কার ও বিশ্বাসের ঘটাপূর্বক পালন। "লোকে মানসিক করে, কয়েকদিনের নিমিত্ত শিবের সন্ন্যাসী হয়। শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢাক বাজিতে থাকে; প্রখর গ্রীষ্মে কড়াং কড়াং শব্দ করে। পাঁচ-সাত দিন ধরিয়া গ্রামে সাড়া পড়িয়া যায়। কোথাও কোথাও অপরাহ্নে চড়ক হয়। পাশের দশ-পনর খানা গ্রামের লোক গাজন ও চড়ক দেখিতে আসে।"[৪]

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। বাংলার গ্রাম-গঞ্জ, পথ-ঘাট মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকের আওয়াজে। আর পাঁচটা গ্রামের মতো নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামও মেতে ওঠে শিব ঠাকুরকে নিয়ে। বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান এই ফুলিয়া বর্তমানে টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য বিখ্যাত- "কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন।/ টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন।।" এই টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নকারী তন্তুবায়রা হলেন মূলত 'বসাক' পদবিভুক্ত। অবিভক্ত ভারতের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার 'বাইশ গাঁ'-এর তাঁতিরা দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসতি গড়ে তোলেন নদিয়া জেলার ফুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় ও ধাত্রীগ্রামে। ভিটেমাটি-হারা এই সব ছিন্নমূল তাঁতিরা শুধু টাঙ্গাইল শাড়িকেই নিয়ে এলেন না, নিয়ে এলেন তাঁদের চিরাচরিত সংস্কৃতি, আচার-বিচার, পালা-পার্বণ। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শেকড় উপড়ানো মানুষগুলো নতুন মাটিতে কোনওক্রমে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই শুরু হল তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা। কাপড়ের পুঁটলি, টিনের বাক্স থেকে বের হল 'কিষ্টযাত্রা' (কৃষ্ণযাত্রা), 'তিন্নাথ' (ত্রিনাথ)-এর গান বা কবিগানের খাতা; চৈত্রপূজার কবিতা, সঙ-এর পালাগানের খাতা। এই সংস্কৃতিচর্চা তাঁদের একান্ত নিজস্ব হলেও কোনও ভিন্ন সংস্কৃতি নয় বা অন্যান্য গ্রামীণ সংস্কৃতির থেকে একেবারে ইতর বিশেষও নয়। তবে এই সকল পালা-পার্বণের চর্চা হয়েছিল বা এখনও হয়ে চলেছে তাঁতি সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব রীতিতে। গ্রাম-বাংলার প্রাচীন উৎসব গাজনেও দেখা যায় বসাক তাঁতিদের নিজস্বতা, উদযাপন ও পরিবেশনে প্রকাশ পায় স্বতন্ত্রতা। উদ্বাস্তু বসাক তাঁতিদের এই পূজার নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে ফুলিয়ার তাঁতশিল্প ও লোকসংস্কৃতি গবেষক মনোহর বসাক (ছদ্মনাম)-এর 'উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা' (২০১৬) নামে একটি বই রয়েছে। সেই বইকে অনুসরণ করে এবং লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে ফুলিয়ার বসাক তাঁতিদের গাজনের উৎসব সম্পর্কে একটি

ধারণা তুলে ধরাই এই রচনার উদ্দেশ্য। ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড়ে টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতিদের বসতি থাকলেও আলোচনার সুবিধার্থে এখানে ফুলিয়াকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই তিনটি তাঁতশিল্প কেন্দ্রের তাঁতিদের গাজন একই যদিও নিয়মকানুনে কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতিদের গাজন 'চৈত্রপূজা' নামেই পরিচিত। 'গাজন' শব্দটি তাঁদের মধ্যে প্রচলিত নয়। আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে এই পূজার প্রচলন হয়েছিল, তার কোনও প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে নেই। সঠিক দিন-ক্ষণ না পাওয়া গেলেও তাঁতি সমাজের মৌখিক যাপনচর্চার ভিত্তিতে বলা যায় যে চৈত্রপূজা বসাক তাঁতিদের পার্বণ তালিকায় যুক্ত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে, উনবিংশ শতকের নয়ের দশকে। বসাক তাঁতিরা টাঙ্গাইলের আদি বাসিন্দা নয়, তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা এবং তৎসংলগ্ন ধামরাই-চৌহাট। তাঁরা ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন বয়নকারী তন্তুবায়দের উত্তরপুরুষ। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই ঢাকাই মসলিন অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং মসলিন তাঁতিরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁদের বসতি গড়ে উঠেছিল ধামরাই-চৌহাটে। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁরা টাঙ্গাইলে এসে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন এই অঞ্চলের সন্তোষ, দেলদুয়ার, ঘারিন্দা, করটিয়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[৫] ঢাকা অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে বসাক তাঁতিদের মধ্যে এই চৈত্রপূজা ছিল না বলেই অনুমিত হয়। কারণ তৎকালীন ঢাকা ও তাঁর অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি নিয়ে ১৮৪০ সালে জেমস টেলরের লেখা 'Sketch of the Topography and Statistics of Dacca' ও ১৮৮৩ সালে জেমস ওয়াইজের লেখা 'Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal' নামক বই দুটিতে ঢাকার বসাক তাঁতিদের নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা বিশদে লিখিত হলেও কোথাও গাজনের উল্লেখ নেই। ঢাকার বসাক তাঁতিরা ছিল বৈষ্ণব, রাধাকৃষ্ণ তাঁদের আরাধ্য। জন্মাষ্টমী ছিল তাঁদের সব থেকে বড় উৎসব।

টাঙ্গাইলে বসাক তাঁতিদের গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ব্রাহ্মণকুশিয়া; তাঁতিরা বলে 'বামুনকুইশ্যা' বা 'বানকুইশ্যা'। এই গ্রামের যাদব বসাকের হাত ধরেই সূত্রপাত হয়েছিল চৈত্রপূজার। এক দিন সকালে গ্রামের পাশের একটি বাওড়ে (ঝিলে) স্নান করতে গিয়ে তিনি সেখানে একটি কাঠের শিবের পাট দেখতে পান এবং সেটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে পূজার্চনা শুরু করেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই এই শিবের পাটটি

পেয়েছিলেন। কালে কালে এই শিবের পাটকে কেন্দ্র করেই শুরু হল চৈত্রপূজা। যাদব বসাক পরিচিতি পেলেন ‘যাদব সন্ন্যাসী’ নামে এবং তাঁর বাড়ি হয়ে গেল ‘বানকুইশ্যা সন্ন্যাসীবাড়ি’। তৈরি হল পূজার নানাবিধ আচার-বিচার, বিধি-বিধান। আস্তে আস্তে বাইশ গাঁয়ের তাঁতিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই পূজা। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল ‘সন্ন্যাসীবাড়ি’ বা ‘দেলবাড়ি’। বছর শেষের মাসের শেষ দশ-বারো দিন তাঁতবোনা বন্ধ রেখে আবালবৃদ্ধবনিতা মেতে উঠলেন শিবের আরাধনায়।

যাদব সন্ন্যাসীর হাত ধরে বৈষ্ণব তন্তুবায় গোষ্ঠীর সমাজ তথা ধর্মীয় জীবনে একীভূত হলেন ভোলা মহেশ্বর। কিন্তু হরের আরাধনায় হরিকে বাদ দিলে চলে কেন! তাছাড়া শিব হলেন পরম বৈষ্ণব। ফলে শিবের পাটে স্থান দেওয়া হল নারায়ণকে, তৈরি হল হরি-হরের মিলিত রূপ। চৈত্রপূজার পাট তৈরি হয় বেলকাঠ দিয়ে। নিমকাঠও ব্যবহার করা হয়। মোটামুটিভাবে তিন থেকে চার ফুট লম্বা এবং সাত-আট ইঞ্চি চওড়া কাঠের পাটাতনের মাথায় খোদাই করা হয় নারায়ণের প্রতীক শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। মাঝে পাটের ওপর ষাঁড়ের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে থাকেন দেবাদিদেব মহাদেব। পাশে থাকে ত্রিশূল। শেষের অংশে চার থেকে নয়টা লোহার গজাল পোঁতা থাকে যেগুলি লাল কাপড়ে মোড়া থাকে।

পূজা শুরু হয় চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ও শেষ হয় পয়লা বৈশাখে। তবে চৈত্র মাসের শেষের দিকে যে কোনও দিন পূজা শুরু করা যায়, নির্দিষ্ট কোনও দিন-ক্ষণ নেই। সেই মতো কোথাও পূজা শুরু হয় দশ-বারো দিন আগে, কোথাও বা চার-পাঁচ দিন আগে। চৈত্রপূজা শুরু করা হলে তাকে বলে ‘ঠাকুর-নামানো’। অর্থাৎ ভোলানাথ তাঁর অধিষ্ঠিত স্থান থেকে নেমে আসেন ভক্তদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। ঠাকুর কত দিন থাকবেন তা হিসাব করা হয় ‘আলতি’ (আরতি) সংখ্যা হিসাব করে। ঠাকুর-নামানোর দিন থেকে আরতি শুরু হয়, চলে হরগৌরীর আগের দিন পর্যন্ত। সেই হিসাবে ঠাকুরকে তিন আলতি, পাঁচ আলতি, সাত আলতি করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে নয় আলতিও করা হয় যদিও তা ব্যতিক্রম। কোথাও পূজা পুরো আচরণ বিধি মেনে হয়, আবার কোথাও কিছু আচার-নিয়ম বাদ দিয়ে সম্পন্ন হয়।

পূজা শুরুর দিন দেলবাড়ির উঠানে ঢাকের বোল ওঠে, সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে উচ্চকিত হয় “শিবোদুর্গা প্রীতে হরি হরি বল, হরিবোল...” ধ্বনি। যতক্ষণ না পর্যন্ত সকলে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঢাকবাদ্য সহযোগে এই

ধ্বনি চলতে থাকে। ঢাক হল এই পুজার প্রধান বাদ্য। পূজার যাবতীয় আচার পদ্ধতি যেমন- ঠাকুর স্নান করানো, ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ, আরতি, মালাজপ, ডালা চালান- সব কিছুই হয় ঢাকের তালে তালে। এর জন্য ঢাকের বোলেরও যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। সকলে জড়ো হলে দেলবাড়ি থেকে শিবের পাট মাথায় নিয়ে সন্ন্যাসীরা পৌঁছে যান নিকটবর্তী কোনও জলাশয় বা গঙ্গা (ভাগীরথী-হুগলি) নদীতে। সেখানে শিব ঠাকুরকে স্নান করানো হয়। ঘাটে চলে পূজার্চনা। একে বলে 'ঠাকুর-চান'। এই ঠাকুর-স্নান দিয়েই সূচনা হয় চৈত্রপূজার।

ঠাকুর-স্নান শেষ হলে সন্ন্যাসীরা ফিরে আসেন দেলবাড়িতে। শুরু হয় দেলবন্দনা। সম্ভবত 'দেউল' থেকে 'দেল' কথাটি এসেছে। পূজার শুরুতে ঢাকের তালে তালে করা হয় এই দেলবন্দনা। এটি মূলত শিবের বন্দনাগান। সাথে অন্যান্য দেবী-দেবতাদেরও স্মরণ করা হয়। দেলবন্দনার নানা ভাগ আছে। যেমন- দশাবতার বন্দনা, নিদ্রাভঙ্গ, দিক বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধূপ ও ধুপতি (ধুনুচি)-এর জন্মকথা; ঢাক, ঢাকের কাচা (কাঠি) ও ঢাকির জন্মকথা, সিঁদুরের জন্মকথা, মইলক্যা (প্রদীপ)-এর জন্মকথা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এগুলির সবই যে আজও টিকে আছে তেমনটা নয়, কালের প্রভাবে অনেকই হারিয়ে গেছে। যেগুলি টিকে আছে সেগুলি দিয়েই এখন কাজ চলছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে দশাবতার বন্দনার কয়েকটি পয়ার তুলে দেওয়া হল-

নমো নমো গুরু আদি দেব সনাতন।
ক্ষীরোদ সাগরে বটপত্রে যাহার শয়ন।।
নমো নমো সত্যযুগ মৎস্য অবতার।
যে রূপেতে করিল চারি বেদের উদ্ধার।।
নমো নমো করপুটে কচ্ছপ মুরতি।
পৃষ্ঠ পরে যে রূপ ধরিল বসুমতী।।
নমো নমো বরাহরূপে দর্শনে বিদরি।
হেলায় সৃজিলে সৃষ্টি পৃথিবী উদ্ধারি।।
নমস্তে নৃসিংহদেব বিরাট আকার।
হিরণ্যকশিপুর দেহ করিল বিদার।।

নমস্তে বামন মূর্তি অতি বিচক্ষণ।

যে রূপে করিলেন প্রভু বলিরে বন্ধন।।... ইত্যাদি[৬]

গঙ্গার ঘাটে স্নানের পর শিবের পূজা।

ছবি : ফুলিয়া মাঠপাড়া কালীবাড়ি বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

'দেলবন্দনা'।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

এর পর সন্ন্যাসীরা পাড়ায় পাড়ায় গৃহস্থের বাড়িতে ঘোরেন শিবের পাট মাথায় নিয়ে। প্রথম দিন নিয়ম রক্ষার্থে সাত বাড়িতে ঘুরলেই হয়। ঠাকুর নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরাকে বলা হয় 'ফির‍্যা'। গৃহস্থের বাড়িতে তুলসিতলায় ঠাকুর রেখে ঢাকের তালে তালে চলে 'কবিতা গাওয়া'। এখানে এই কবিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। কারণ একটি ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সাহিত্যচর্চার নিদর্শন এই কবিতাগুলি লোকসাহিত্যের একটি সম্পদরূপে পরিগণিত হতে পারে। এই সব কবিতার অধিকাংশই রচিত হয়েছে ওপার বাংলায় যখন বর্ষশেষের এই গাজনের উৎসব তাঁতিদের প্রধান আনন্দ-উৎসব বলে গণ্য হতো। এর জন্য চলতো সম্বৎসরের প্রতীক্ষা, চলতো প্রস্তুতি- সঙের পালা, সঙের গান আর কবিতা রচনা। কবিতাগুলির সুর দিতেন মূলত কবিরাই। ভনিতায় রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। তবে সব কবিতার নয়। কারণ অনেক কবিই নিজেদের নামোল্লেখ করেননি। অনেকে আবার শিক্ষাগুরুর নামসহ ভনিতা লিখে গেছেন। যেমন- "শিক্ষাগুরু নরেশবাবু ছিলেন এ ধরায়।/ ঘারিন্দাতে বাড়ি আমার বঙ্ক বলে সবাই কয়।।" (কবিতা- 'ধরাদ্রোণের অতিথিসেবা') অথবা "হৃদয় বসাক কয়, ওহে দয়াময়, দাসের এই নিবেদন,/ পাই যেন দরশন, আমি অতি মূঢ়জন,/ অন্তিমেতে দিও মাথে ও

রাঙা চরণ।।" (কবিতা- 'কংস বধ')। এই কবিতাগুলির বেশিরভাগই তাঁতিদের নিজস্ব রচনা। অনেকে তাঁত বুনতে বুনতে মুখে মুখেই কবিতা রচনা করতেন। তবে অন্যান্য কবিদের রচনাও আছে যাঁদের চলাফেরা ছিল তাঁতিদের সাথে। এমনকি মুসলমান কবির কবিতাও আছে। ভনিতায় পাওয়া যায় "তেরশ সাতাশ সালে আবদুল্লা বলে, কথা মিথ্যা নয়।/ ভুলত্রুটি মাপ করিবেন, শোনেন মহাশয়।।" (কবিতা- 'কুমুদবাবু')। অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে লেখা। যেমন- 'দক্ষযজ্ঞ', 'প্রহ্লাদ চরিত', 'মহিষাসুর বধ', 'রামের বনবাস', 'রাবণ বধ', 'অহল্যা উদ্ধার বা পাষাণ উদ্ধার', 'কৃষ্ণ সুদামা', 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' ইত্যাদি। চৈতন্যলীলাকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'নিমাই সন্ন্যাস', 'শচীর বিলাপ', 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ', 'ভক্ত হরিদাস' ইত্যাদির মতো কবিতাগুলি। আবার বিভিন্ন সামাজিক ও সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে। যেমন- 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী', 'বাস্তুহারা', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। একই বিষয়ে ও একই নামে একাধিক জনের কবিতা পাওয়া যায়। তবে ছন্দ, ভাষা ও বাক্যগঠনের শৈলীর ভিন্নতা দেখা যায়। আবার একই কবির রচিত কবিতার পাঠান্তর পাওয়া যায়। সম্ভবত স্মৃতি থেকে লিখিত নেওয়ার সময় কিছু কিছু পয়ারে, কথায়, ছন্দে পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরবর্তীতে এক খাতা থেকে অন্য কেউ টুকে নেওয়ার সময়ও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই সকল কবিরা এক অকৃত্রিম গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে থেকে সহজাত প্রতিভায় কবিতার ভাব-ভাষা ও গানের সুর-তাল-লয় যেভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর! তবে পুঁথিগত ও প্রথাগত শিক্ষার অভাবের কারণে বানান বা সাধু-চলিতের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থেকে গেছে।[৭]

চৈত্রপূজা উপলক্ষ্যে বহু সংখ্যক কবিতা লেখা হলেও তার অধিকাংশেরই আজ আর হদিশ মেলে না। দেশভাগের সাথে সাথে সেগুলিও হারিয়ে গেছে! কিছু কিছু রক্ষিত আছে কয়েক জনের কাছে, কিছু আছে অলিখিত- দু'এক জন প্রবীণের স্মৃতিতে। তাই দিয়েই এখনও কাজ চলে। কবিতাগুলি দীর্ঘ হয়, কোনও কোনও কবিতা গাইতে গেলে এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায়। পয়ার ছন্দের কবিতাগুলিকে সুর করে, ঢাকের তালে, লয়ে পড়তে হয় বলে একে 'কবিতা গাওয়া' বলে। কোথাও কোথাও হারমোনিয়ামও ব্যবহার করা হয়। ফির্যায় গিয়ে কোথাও দু'চার পয়ার, কোথাও অর্ধেক আবার কোথাও বা সমঝদার গৃহকর্তার অনুরোধে পুরো কবিতাই গেয়ে শোনাতে হয়। এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতার কয়েকটি পয়ার তুলে দেওয়া হল।

Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p88-100. (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

কবিতা : কংস বধ (পয়ার সংখ্যা ৩২)

রচয়িতা : হৃদয় বসাক, নলশোঁধা

পয়ার ১. শুন সর্বজন, করি নিবেদন, কথা অতি পুরাতন
বলি তাহার বিবরণ, আছে ব্যক্ত এই ত্রিভূবন
যে রূপেতে কংস ধংস করলেন নারায়ন।

পয়ার ২. একদিন বলছে কংস, করব ধংস, ব্রজের সেই নন্দের নন্দন
শুন অপধন, অক্রুর, যাও হে তুমি বৃন্দাবন
যজ্ঞ স্থলে, সেই গোপালে, আনহে এখন।

পয়ার ৩. হয়ে হরশিত, আনন্দিত, রথখানা করিয়া সাজন
করিলেন গমন, যেয়ে উপনিত বৃন্দাবন
বলে ওহে নন্দ, শ্রীগোবিন্দ, নিতে চাই এখন।...ইত্যাদি।[৮]

গৃহস্থ বাড়ির তুলসি তলায় শিবের পাট।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

'কবিতা গাওয়া'।

ছবি : ফুলিয়া মাঠপাড়া কালীবাড়ি বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

কবিতা গাওয়ার সাথে সাথেই চলে ঠাকুর বরণ। বরণ করেন বাড়ির গৃহিণীরা, কোথাও বা সন্ন্যাসীরা। ঠাকুর বিদায় কালে দেওয়া হয় 'ভুক্তা'- চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু, পটল ইত্যাদি। দিনান্তে এই ভুক্তাই রান্না করে আহার করেন সন্ন্যাসীরা। আবার কোনও গৃহী নিজ বাড়িতে 'ঠাকুর-অতিত' (অতিথি) নেন। সম্পন্ন গৃহকর্তা এক সাথে দুই-তিনটি ঠাকুরকেও অতিথি করেন। তৈরি হয় অস্থায়ী মন্ডপ। সেখানেই ঠাকুর থাকেন। চলে পূজা, রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া। পরের দিন বাসি-পান্তা খেয়ে সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে পড়েন ফির‍্যায়। ফুলিয়ার বাইরে দূর-দূরান্তেও ঠাকুর অতিথি হয়ে যান। সেখানকার কোনও ভক্তের মানত থাকলে তাঁরা ঠাকুর নিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ির ঠাকুরই বেশি বাইরে যান। ঠাকুর নিতে গেলে প্রায় এক বছর আগেই জানিয়ে রাখতে হয়।

ঠাকুরের পাট নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরার পর্ব চলে চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন আগে পর্যন্ত। এর পর ঠাকুর নিজ মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন। এই দিন সন্ধ্যাবেলায় দেলবাড়ির মূল মন্দিরে অধিবাস শুরু হয়, চলে ভোগরাগ সহ পূজারতি। শিবের দারুমূর্তিকে স্নান করিয়ে নানা অলংকারে সাজানো হয়। বেশিরভাগই ভক্তদের দেওয়া। সাজানোর পর ঠাকুর বরণ করা হয়। বরণ করেন মূল সন্ন্যাসী। এর পর একে একে মূল সন্ন্যাসী, সংযমী, ঢাকি, ঢাক ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদেরও বরণ করা হয়।

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হয় 'হরগৌরী' অর্থাৎ শিব-পার্বতীর নাচ। দু'জন মানানসই পুরুষকে শিব ও পার্বতী সাজানো হয়। শিব-পার্বতী সাজতে গেলে তাঁদের কিছু নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করতে হয়। দেলবাড়ির উঠান থেকেই নাচ শুরু হয়। তার আগে দেলবাড়ির উঠানে আসন পেতে বরণ করা হয় হর-গৌরীকে। এরপর হর-গৌরীকে 'পার' হতে হয়। আসন ছেড়ে সামনে পা বাড়ানোর আগে গৃহকর্তা তাঁদের সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে থাকেন। তাঁকে ডিঙানো যাবে না, পিঠে পা দিয়ে পার হতে হবে। কিন্তু যাঁরা হর-গৌরী সাজেন, গৃহকর্তা তাঁদের থেকে সাধারণত বয়ঃজ্যেষ্ঠ হবার কারণে বা সম্মান প্রদর্শনহেতু পা দিয়ে পার না হয়ে তাঁর পিঠে হাত ঠেকিয়ে কপালে ছুঁইয়ে পাশ কাটিয়ে পার হয়ে আসেন। তবে গৃহকর্তা নাছোড়বান্দা হলে পা দিয়েই পার হতে হয়। চার-পাঁচ দিন ধরে যে সব বাড়িতে 'ফির‍্যা' যাওয়া হয়েছিল, এক দিনেই সব বাড়িতে হরগৌরীর নাচ হয়। সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই নাচ। অনেক সময় সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। সামাল দেওয়ার জন্য বেশির ভাগ দু'জোড়া হরগৌরী সাজানো হয়।

হরগৌরীর দিন দুপুরে দেলবাড়িতে হয় 'হরপার্বতীর পূজা'। শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মাটির মূর্তি পূজা করা হয়। পূজা করেন পৈতেধারী পুরোহিত। দুপুরে হয় নীলের পূজা। এই দিন সন্ধ্যায় দেলবাড়িতে 'ডালাপূজা', 'মালাজপা', 'ডালা চালান' ইত্যাদি পূজার নানাবিধ ক্রিয়াকান্ড চলে। একেক পূজার একেক নামকরণ। এই সব পূজার নিয়ম-কানুন সব জায়গায় অভিন্ন হয় না। মন্দির আঙ্গিনার বাইরের একপাশে শ্যাওড়া গাছের তলায় হয় 'বুড়িপূজা'। শ্যাওড়া গাছকে দেবতা ভেবে পূজা করা হয়। আসলে এটি বনদুর্গার পূজা। দুর্গা মন্ত্রে পূজা করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এই পূজার ক্ষেত্রে কালো পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। তবে দু'একটি চৈত্রপূজা ছাড়া সব জায়গাতেই বলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু জায়গায় ভক্তদের মানত করা পায়রা ওড়ানো হয়। এ ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈশ্যাল পদ্ধতিতে পূজা করেন মূল সন্ন্যাসী।

হরগৌরীর 'পার হওয়া'।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

গৃহস্থের উঠানে হরগৌরীর নাচ।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

এই দিন রাত্রে হয় 'হাজরা পূজা'। 'হাজির' বা হাজিরা' কথাটা থেকে সম্ভবত 'হাজরা' কথাটা এসেছে। দেলবাড়ি থেকে অন্যত্র হাজির হয়ে এই পূজা করতে হয়। সাধারণত জনবসতি থেকে দূরে মাঠের প্রান্তে বা শ্মশানের পাশে এই পূজা করা হয়। যে স্থানে পূজাটি হয় তাকে বলে 'হাজরা খোলা'। হাজরার পূজা শুরু হয় গভীর রাত্রে, চলে সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত। প্রথমে দেলবাড়ি থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে হাতে ধুমায়িত ধুনুচি দিয়ে হাজরা খোলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একে বলে 'ধূপ চালান'। হাজরা খোলায় আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা থাকে। বৈশ্যাল পদ্ধতিতে এখানে পূজা হয়, চলে 'ভরে পড়া', 'জব নেওয়া' ইত্যাদির মতো হরেক ক্রিয়াকান্ড। পূজা দেখার জন্য গ্রামের অনেকেই হাজরা খোলায় হাজির হন। যাদের মানত থাকে তারা সেই সময় মানত রক্ষা করেন। বলিও দেওয়া হয়। হাজরার একটি অংশ হল 'দেবী হাজরা' ও 'কালী হাজরা'। হাজরা পূজাতে অনেক সময় সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকে সুদর্শন এক জনকে দেবী দুর্গা সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথাও বা দেবী কালীকে সাজানো হয়। দুর্গা সাজিয়ে পূজাকে বলে দেবী হাজরা এবং কালী সাজিয়ে পূজাকে বলে কালী হাজরা। সব গাজনের দলেই দেবী হাজরা বা কালী হাজরা হয় না, দু'একটি দলে হয়। ওপার বাংলায় প্রায় সব গ্রামেই নিয়ম করে দেবী হাজরা বা কালী হাজরা হতো।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। ছবি : লেখক।

তাঁতিপাড়ার গাজন বা চৈত্রপূজার ক্রিয়াকাণ্ডে নানা রকম অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয়ঙ্কর বা বিপজ্জনক তেমন কোনও কান্ড-কারখানা এখানে নেই। বিশেষ করে বাণ ফোঁড়া বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নানা রকম কেরামতি দেখানো- এসব কোনও কিছু নেই। এমনকি চড়ক গাছেও ঘোরানো হয় বুকে-পিঠে শক্ত করে কাপড় দিয়ে বেঁধে, বঁড়শি গেঁথে নয়। তবে ফুলিয়ার বসাক তাঁতিদের মধ্যে কয়েকটি চৈত্রপূজায় পেটের দুই পাশের চামড়ার মধ্যে দিয়ে লোহার শলাকা বিঁধিয়ে দিয়ে তার সামনে ধূপের সাহায্যে আগুন নিয়ে কিছু কেরামতি

আছে। একে বলা হয় 'দশ নলি'। আবার জিভের মধ্যে দিয়ে শলাকা বেঁধানোরও চল ছিল ওপার বাংলায়। একে বলত 'আদ্য নেওয়া'। এখন আর সেটি নেই। দশনলি নেওয়ার লোকও এখন পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হরগৌরীর মতোই একটি নাচ হয়। এখানে শিব-কালীর সাথে রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা প্রভৃতি সাজানো হয়। এই দিন ঠাকুরকে দেওয়া হয় ছাতুভোগ। সংক্রান্তিতে বসাক তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ পরব দেখতে পাওয়া যায়। এটি অনেকটা ভাইফোঁটা ধরনের। বোনেরা ভাইয়েদের ছাতু খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। যবের ছাতুর সাথে থাকে মাঠা দই, নাড়ু-মোয়া ইত্যাদি এবং দুপুরে অন্নভোজন। একে 'ছাতু খাওয়া' বা 'ছাতুর নিমন্ত্রণ' বলে। আহার্য সব নিরামিষ হয় কারণ এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসকাল তখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া গাজনে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ বা শেষ দশ-বারো দিন তাঁতিপাড়ার অধিকাংশ বাড়িতেই নিরামিষ হয়। এ দিনই হয় 'চড়ক পূজা'। ও দেশে চড়ক তাঁতিপাড়ার গাজনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে এ দেশে আসার পর গাজনের অধিকাংশ দলই আর চড়কের আয়োজন করে না। সম্ভবত চড়ক গাছ ও চড়ক ঘোরানোর জায়গার অভাবের কারণেই এটা বন্ধ হয়ে গেছে। চড়ক গাছ তৈরি হয় দশ-বারো হাত লম্বা নিম বা শিমুল গাছ দিয়ে। চড়ক শেষ হলে চড়কের গাছটিকে জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখতে হয়। ও দেশের মতো জলাশয়ের প্রাচুর্যও এ দেশে নেই। ফুলিয়ার মাত্র দুটি জায়গায়, তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি এবং মাঠপাড়া কালীবাড়িতে গাজনের চড়ক ঘোরানো হয়। তবে চড়কের পূজা হয় দেলবাড়িতেই, মাটিতে পাটকাঠি পুঁতে। এইদিন মাঝরাতের পর হয় 'টল'। 'টহল' কথাটি সংক্ষিপ্ত হয়ে 'টল' হয়েছে। এখানে ঢাকের পরিবর্তে খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন গেয়ে সারা পাড়া ঘোরেন সন্ন্যাসীর দল। টল শেষ হয় ভোরে। দু'একটি দলেই এই টল টিকে আছে এখনও।

চৈত্রপূজার চড়ক।

ছবি : ফুলিয়া মাঠপাড়া কালীবাড়ি বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

'দশনলি'।

ছবি : ফুলিয়া পশ্চিম মাঠপাড়া বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

পয়লা বৈশাখের দিন হয় ভূতের মেলা। মেলাটি হয় তালতলা পাড়ায়। সকাল থেকেই মেলা শুরু হয়ে যায়, চলে সারা দিন। ওদেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুশিয়া গ্রামেই অর্থাৎ যাদব সন্ন্যাসীর বাড়ির শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করেই এই ভূতের মেলা হতো। দেশভাগের পর সন্ন্যাসীবাড়ির ঠিকানা হয় ফুলিয়ার তালতলা পাড়ায়। ফলে এখানেও তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ির পূজাকে কেন্দ্র করেই মেলাটি হয়। তবে বর্তমানে বুঁইচাপাড়া তাঁতপল্লীতেও আরও একটি ভূতের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আর পাঁচটা গ্রাম্য মেলার মতোই এই মেলার সাথে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সারাদিন মরাকাঠটানা তাঁতিদের আবেগ।

প্রথম দিনের মতো এ দিনও ঠাকুর স্নান হয় কাছাকাছি কোনও জলাশয়ে। তার পর সারা দিন ধরে চলে শিবের মাথায় 'জল ঢালা'। এই মেলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল ভূতরূপী 'নিস্কুন্ধ্যা'-এর পূজা। সম্ভবত 'নিস্কন্ধ' অর্থাৎ 'যার স্কন্ধ নাই' থেকেই তাঁতিদের কথ্য ভাষায় 'নিস্কুন্ধ্যা' শব্দটি এসেছে। একে আবার 'নিশিকান্ত' নামেও ডাকা হয়। মাটি দিয়ে বানানো এই ভয়ঙ্কর মূর্তিটির মাথা নেই। গোলাকৃতি দুটো চোখ, টিলার মত নাক, বিকটাকার হাঁ করা মুখে ভয়াল দাঁতের সারি ও রক্তরাঙা জিহ্বা- সবই বুকের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কে এই নিস্কুন্ধ্যা যাকে ভূতের মেলায় প্রধান ভূত হিসাবে গাজনের সন্ন্যাসীরা পূজা করে, একাধিক বলি দেয়? এই ভূতের পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। তবে মূর্তিটি রামায়ণে বর্ণিত কবন্ধের বর্ণণার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত কবন্ধের কাহিনিই এই মূর্তির উৎস। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে কবন্ধের পরিচয় বিষয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকি রামায়ণানুসারে, শ্রী নামক দানবের পুত্র দনুর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান ব্রহ্মা তাকে দীর্ঘ আয়ু দান করেন। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে দনু দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর বজ্রের আঘাতে দনুর দুই উরু ও মাথা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিলেন। এর পর দনু প্রাণভিক্ষা চাইলে দেবরাজ তাকে যোজনপ্রমাণ দুই হাত দিলেন ও উদরে তীক্ষ্ণদন্ত মুখ নিবেশিত করলেন। উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তিনি আরও জানালেন, রাম-লক্ষণ তার বাহু ছেদন করলে সে মুক্তি পাবে। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবন্ধের পরিচয়ে জানা যায় যে কুম্ভক নামের কোনও এক রাজা ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে মাংসপিন্ডে পরিণত হন; হাত-পা, চোখ-কান-মুখ সব পেটের ভিতরে ঢুকে যায়। মুক্তির উপায়ে মুনি জানান, রামরূপে বিষ্ণুর অবতার তাঁকে উদ্ধার করবেন।

কবন্ধের শাপমুক্তির বর্ণনা দুটি ক্ষেত্রে একই পাওয়া যায়। সীতান্বষণে রাম-লক্ষণ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমন কালে কবন্ধের কাছে আসেন এবং রাম কর্তৃক কবন্ধের মুক্তিলাভ হয়। দনু বা কুম্ভক মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সীতা উদ্ধারের সাহায্যার্থে রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সন্ধান জানান। কবন্ধরূপী দনু বা কুম্ভকের পূজা পাওয়ার কোনও বরলাভের কথা রামায়ণে উল্লেখ নেই। তাঁকে রামের ভক্ত বলা গেলেও শিবের প্রতি তার অনুরাগের কথা জানা যায় না। তবুও কী কারণে শিবঠাকুরের চেলাদের প্রধান হয়ে কবন্ধরূপী 'নিস্কুন্ধ্যা' গাজনের সন্ন্যাসীদের পূজা পায়, তা জানা যায়নি।[৯] অনুমিত হয়, আগে যখন ভূতের মেলার জন্য ভূতের মূর্তি তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তখন কবন্ধের বিবরণকেই ভূতের আকৃতি হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

নিস্কুন্ধ্যা বা কবন্ধ।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

হরকালী।

ছবি : ফুলিয়া পশ্চিম মাঠপাড়া বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

কবন্ধের পূজা হয় দুই পর্বে। প্রথম পর্বের পূজা করেন পুরোহিত, পবনদেবের মন্ত্র পড়ে। কারণ কবন্ধের পূজা-পদ্ধতি কোনও পুরোহিত দর্পণে নেই। দ্বিতীয় পর্বে পূজা করেন সন্ন্যাসীরা, মূল সন্ন্যাসী কিংবা তার সহকারী। কবন্ধের পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মেলার মাঠের কেন্দ্রস্থলে মূর্তি তৈরি করা হয়। সারা বছর মূর্তি সেখানেই থাকে, রোদে-জলে নষ্ট হয়। গাজনের সময় আবার তাতে মাটি চাপিয়ে, রং লাগিয়ে নতুন করে তৈরি করা হয়।

শিবের মাথায় 'জল ঢালা'।

ছবি : ফুলিয়া তালতলা সন্ন্যাসীবাড়ি চৈত্রপূজা কমিটি।

ডাঙ খেলার প্রস্তুতি।

ছবি : ফুলিয়া পশ্চিম মাঠপাড়া বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

পয়লা বৈশাখের দিন দেলবাড়িতে শিবের মন্দিরের পাশে বাঁশ, খেজুর পাতা ইত্যাদি দিয়ে ছাউনি তৈরি করে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। দেলবাড়ির আঙ্গিনায় কাদার মধ্যে হয় 'ডাঙ খেলা' বা 'কাদা খেলা'। এই দিন দেলবাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে দুটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যথা- 'আমভঙ্গ' বা 'আমভাঙা' ও 'হলকর্ষণ'। এই অনুষ্ঠানের পর গাজনের সমাপ্তি ঘটে। স্বর্ণলঙ্কায় হনুমানের প্রবেশ এবং পরিশেষে লঙ্কা দহন হল আমভাঙা আচারের উপজীব্য। কথিত আছে, ভারতবর্ষে আম এসেছিল লঙ্কা থেকে। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে আম খেয়ে তার আঁটি ছুড়ে ফেলেছিল। সেই আঁটি সাগর পার হয়ে ভারতের মাটিতে এসে পড়ে আমগাছ হয় এবং পরে সারা ভারতে তা বিস্তার লাভ করে। সেই কাহিনিটি এখানে অভিনয় করে দেখানো হয়। অভিনয় করেন সন্ন্যাসীরাই। দ্বিতীয় পর্বে হলকর্ষণ। কয়েক জন সাজেন চাষের বলদ, কয়েক জন চাষি। জমিতে লাঙল দেওয়া থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত সব কিছুই দেখানো হয় এই পর্বে । এই উৎসব দুটি মূলত কৃষিভিত্তিক। তন্তুজীবীদের পূজায় তাঁতের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কৃষিকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর নেই। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা। এর মধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তিই প্রধান। কৃষি থেকে খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে তাই সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে এবং কৃষককুলের প্রতি

শ্রদ্ধা জানাতে চাষবাসের অনুষ্ঠানকে এই উৎসবের অঙ্গ করা হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। ধানকাটার পরে একটি বেতের কাঠায় ধান ভরা হয়। সেই ধানের কাঠা মূল সন্ন্যাসী মাথায় করে নিয়ে চলেন দেলবাড়ির অন্দরমহলে। একে বলে 'ভরা তোলা' বা 'ভরা নেওয়া'। ঢাকের বোল ওঠে, মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়। সন্ন্যাসী গৃহদ্বারে পৌঁছে হাঁটু মুড়ে বসেন। দেলবাড়ির গৃহিনী তাঁকে বরণ করেন এবং মাথা থেকে ধানের কাঠাটা নামিয়ে কাঁখে করে চলে যান ঘরের ভেতরে। এই সময় সন্ন্যাসী ও ভক্তদের গায়ে ছিটানো হয় শান্তির জল। তাঁদের হাতে দেওয়া হয় খোল-জল। তা গায়ে মেখে ঘাটে গিয়ে স্নান করেন তাঁরা। এরপরে সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ভঙ্গ করার জন্য আমিষ আহারের ব্যবস্থা হয়। বলি দেওয়া পাঁঠার মাংসসহ মাছ ও অন্যান্য ব্যঞ্জন রান্না হয়। রান্না করেন পাড়ার রাঁধুনিরাই। এই আয়োজনকে বলা হয় 'মৎসমুখী' বা 'আঁশমুক্তি'। গ্রামের সকলের নিমন্ত্রণ থাকে এই আয়োজনে। সন্ন্যাসীদের সাথে পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া করেন সকলে।

চৈত্রপূজার সঙ।

ছবি : ফুলিয়া পশ্চিম মাঠপাড়া বারোয়ারি চৈত্রপূজা কমিটি।

তন্তুজীবী সমাজে যখন চৈত্রপূজা বা গাজনের সূচনা হয় তখন তা আজকের মতো বারোয়ারি উৎসব ছিল না। পূজায় গ্রামের সকলে অংশগ্রহণ করতেন বটে তবে পাড়াগাঁয়ের কোনও সম্পন্ন পরিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিত এবং তার ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ভার বহন করত। এ দেশে এসে উদ্বাস্তু জীবনে সেই রকম সম্পন্ন পরিবার আর কোথায়! অগত্যা সকলের যৌথ উদ্যোগে বারোয়ারি ভাবেই শুরু হয়েছিল পূজা। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল শাড়ির ব্যবসা করে অনেকেই সম্পন্ন হয়েছেন বটে কিন্তু তত দিনে বারোয়ারি ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়ে গেছে। আগে ও দেশে পুজো হতো প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে। এ দেশে এসে তিন-চার গ্রামের লোক একটি গ্রামে এসে বসবাস করার ফলে পূজা হয় পাড়াভিত্তিক।

সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই পরিবর্তন হয়। রক্ষণশীলতা কমে, নিয়ম শিথিল হয়। আগে যতটা কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা ও আনন্দ-উন্মাদনার সাথে চৈত্রপূজা করা হতো, এখন তা অনেকটাই কমেছে; কমেছে নানাবিধ মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহারও। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। 'খাটনা' বলে সন্ন্যাসীদের এক প্রকার নাচ হতো। যে বাড়িতে

'ঠাকুর অতিত' যেতেন সেই বাড়িতে রাত্রে দু'তিনটি দলের সন্ন্যাসীদের মধ্যে নাচের প্রতিযোগিতা হতো। তার জন্য আগে থেকে মহড়াও দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সেই অঙ্গ প্রায় নেই বললেই চলে। যদি কোনও গৃহস্থ অনুরোধ করেন তাহলে সামান্য লাফাঝাপা করেই সেই কাজ শেষ করা হয়। আবার আগে 'সঙ' ছিল চৈত্রপূজার অত্যাবশ্যকীয় অংশ এবং বিনোদনও বটে। এই সঙযাত্রা নিয়ে মনোহর বসাকের বইতে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তাই এই বিষয়ে এখানে আলোচনা করে রচনাকে আরও দীর্ঘায়িত না করে বলা যায় এখন এই সঙ প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। কারণ মানুষের কাছে এখন বিনোদনের নানা উপকরণ সহজলভ্য। কালে কালে হয়তো আরও অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। মনোহর বসাক উদ্যোগী হয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন যার কিছুটা প্রকাশিত। কিন্তু চৈত্র- পূজার কবিতা থেকে শুরু করে অনেক কিছুই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। লোকসংস্কৃতির এই অংশকে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি, নচেৎ তা হবে আত্ম-বিস্মৃতির নামান্তর!

তথ্যসূচি

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সংস্করণ ২০১১), *বাংলা ভাষার অভিধান*, প্রথম ভাগ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬৬৮

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ (২০২১), 'শুকজোড়ার গাজনে রাক্ষস নাচ', *বহুরূপে বাঁকুড়া*, বাঁকুড়া, পৃষ্ঠা- ৩২

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র (১৩৫৮ আশ্বিন), *পূজা-পার্বণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫৬, https://archive.org

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র (১৩৫৮ আশ্বিন), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬, https://archive.org

আকন্দ, শাওন (২০১৮), 'বাংলাদেশের তাঁতশিল্প', *দেশাল*, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১২৮-১২৯; বসাক, নিলয় কুমার (২০২০), টাঙ্গাইল শাড়ির কথা, পত্রিকা অন্যমন, ফুলিয়া, পৃষ্ঠা- ৬০-৬১

বসাক, মনোহর (২০১৬), *উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা*, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২১

বসাক, মনোহর (অপ্রকাশিত), *গাজনের কবিতা*

বসাক, হরিপদ (সংগ্রহ), *চৈত্রপূজার কবিতার পাণ্ডুলিপি*

বসাক, মনোহর (২০১৬), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০-৪২

ব্যক্তিঋণ : হরিপদ বসাক, ক্ষিতীশচন্দ্র বসাক, সন্তোষ বসাক, রঘুনাথ বসাক, নরেশ বসাক, সুশান্ত বসাক